সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?

অভিজিৎ রায়

অনেকেই সমকামিতা নিয়ে বেজায় বিব্রত থাকেন। নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন। কাঠমোল্লারা তো গালি দিয়ে খালাস- সমকামিরা হচ্ছে খচ্চর স্বভাবের, কুৎসিৎ রুচিপূর্ন, মানসিক বিকারগ্রস্ত। এমনকি প্রগতিশীলদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম ওজর আপত্তি। যারা শিক্ষিত, 'আধুনিক' শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, গে লেজবিয়ন ইত্যকার তথাকথিত 'পশ্চিমা' শব্দের সাথে কমবেশি পরিচিত হয়েছেন, তারাও খুব কমই ব্যাপারটিকে মন থেকে 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নিতে পারেন। তাদের অনেকেই এখনো ব্যাপারটিকে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' মনে করেন, আর নয়ত ভাবেন - পুরো ব্যাপারটি উৎকট ধরনের ব্যাতিক্রমধর্মী কিছু, এ নিয়ে 'ভদ্র সমাজে' যত কম আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল। উপরে উপরে না বললেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই মনে করেন সমকামীরা তো হচ্ছে গা ঘিন ঘিনে বিষ্ঠাকৃমি জাতীয় এঁদো জীব। মরে যাওয়াই মনে হয় এদের জন্য ভাল। সমাজ সভ্যতা রক্ষা পায় তাহলে।

আমি এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দিক (মুলত জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের দৃষ্টিভঙ্গি) থেকে নির্মোহভাবে বিষয়টি আলোচনা করব। সামাজিক ও মনস্তাত্বিক ধ্যান-ধারণাগুলো আলোচনায় আসবে পরে, প্রবন্ধের শেষ দিকে। আমি নিজে সমকামী নই, কিন্তু সমকামী বন্ধু-বান্ধবদের জীবন প্রত্যক্ষ করার এবং এ নিয়ে কিছু পড়াশুনা করার ও লেখালেখি করার সুবাদে কিছু ধারনা অর্জন করেছি। আমার এ প্রবন্ধটি সে চিন্তাভাবনারই ফসল বলা যেতে পারে। পাঠক-পাঠিকাদের হয়ত এ প্রবন্ধ ভিন্নমাত্রার আবেদন তৈরি করবে বলে মনে করি। তবে, এ নিয়ে পাঠকদের ভিন্নমত থাকলে আমি তা সদরে পর্যালোচনা করতে, এবং যুক্তিনিষ্ঠ হলে তা গ্রহণ করতে রাজী। আমি প্রবন্ধটি শুরু করছি ভুল ভাবে ব্যবহৃত কিছু মন্তব্য দিয়ে, যা সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় :

"সমকমীতা প্রাকৃতিক কোনোভাবেই হতে পারে না মূলত (নারী-পুরুষে) কামটাই প্রাকৃতিক"

কিংবা অনেকে এভাবেও বলেন -

"নারী আর পুরুষের কামই একমাত্র প্রাকৃতিক যা পৃথিবীর সকল পশু করে। যার মূল লক্ষ্য হলো বংশ বৃদ্ধি"

উক্তিগুলো স্রেফ উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেকেই সমকামিতাকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' বা 'অস্বাভাবিক' হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য উপরোক্ত ধরণের যুক্তির আশ্রয় নেন। আমি এই উক্তির পেছনের যুক্তিগুলো নিয়েই মূলতঃ আলোচনা করব।

আসলে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' , 'অস্বাভাবিক', 'প্রাকৃতিক নয়' -এই ধরণের শব্দচয়ন করার আগে এবং তা ঢালাওভাবে তা প্রয়োগ করার আগে কিন্তু খোলা মনে পুরো বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল 'স্বাভাবিক' (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন) আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ'। সয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে -

> *'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোন কাজেরই কথা নয়।'*

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু-গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রাবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের 'প্রাকৃতিক', আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙ্গে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোষাক শিল্পে নিয়োজিত করে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজার করে চলেছে - তারা সবাই আসলে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' কুকর্মে নিয়োজিত - কারণ, 'প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না'। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, আমেরিকার নাসা থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' খুব সহজ একটি মাধ্যম, অনেকের কাছেই। তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা 'শিক্ষিত জনেরা' বড্ড ভালবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামি, উভকামিদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই তা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্ধুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরণের কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের (logical fallacy)। ইংরেজীতে এই ফ্যালাসির পুথিগত নাম হল - 'ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল বা অ্যাপিল টু নেচার '। এমনি কিছু 'অ্যাপিল টু নেচার' হেত্বাভাসের উদাহরণ দেখা যাক -

> *১। মিস্টার কলিঙ্গের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিঙ্গ ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা*

বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মত গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।

২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং 'কম্পলিটলি ন্যাচারাল'।

৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।

৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেক্সুয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ?

এমনি উদাহরণ দেওয়া যায় বহু।

উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষনীয় 'প্রকৃতি' নামক মহাস্ত্রকে পুঁজি করে গায়ের জোরে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ট ষাঁড়দের স্বভাবজাত অ্যাপিল টু নেচার-এর শিকার হচ্ছে সমকামীরা। অনেক সময় সমকামিদের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সাংগঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘৃণা। সমকামিতাকে একটা সময় দেখা হয়েছে মনোবিকার, মনোবৈকল্য বা বিকৃতি হিসেবে। সমকামিদের অচ্ছুৎ বানিয়ে এদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তো আছেই, কখনো এদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহননের পথে। আর এগুলোতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে ধর্মীয় সংগঠন এবং রক্ষণশীল সমাজ। সমকামিদের প্রতি হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে ইংরেজীতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি শব্দ - হোমোফোবিয়া (Homophobia) । মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে এটি নিতান্ত অন্যায়। মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের প্রেক্ষাপট থেকে এগুলো নিয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আগে সমকামিতা বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমাদের জানা দরকার।

সমকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। ল্যাটিন ভাষায়ও 'হোমো' শব্দটির অস্তিত্ব রয়েছে। তবে 'ল্যাটিন হোমো' আর 'গ্রীক হোমো' কিন্তু সমার্থক নয়। ল্যাটিনে হোমো অর্থ মানুষ। ওই যে আমরা নিজেদের হোমোস্যাপিয়েন্স ডাকি - তা এসেছে

ল্যাটিন ভাষা থেকে। কিন্তু গ্রিক ভাষায় 'হোমো' বলতে বোঝায় 'সমধর্মী' বা 'একই ধরণের'। আর সেক্সাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। কাজেই একই ধরনের অর্থাৎ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। সমকামিতার ইতিহাস প্রাচীন হলেও ইংরেজীতে শব্দটির ব্যাবহার কিন্তু খুব প্রাচীন নয়। একশ বছরের কিছু বেশি হল শব্দটি চালু হয়েছে। শুধু ইংরেজী কেন, ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতেও সমকামিতা এবং সমকামিতার বিভিন্নরূপকে বোঝাতে কোন উপযুক্ত শব্দ প্রচলিত ছিল না। বাংলায় 'সমকামিতা' শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ -'সমকামী' থেকে। আবার সমকামী শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত 'সমকামিন' শব্দটির মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তাকে 'সমকামিন' বলা হত। সম এবং কাম শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে 'সমকামিন' (সম + কাম + ইন) শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার ধারণা সমকামিতা নামের বাংলা শব্দটির ব্যাবহারও খুব একটা প্রাচীন নয়। প্রাচীনকালে সমকামীদের বোঝাতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হত। যেমন, বাৎসায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামীকে চিহ্নিত করতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এ শব্দের বহুল ব্যবহার আর লক্ষ্য করা যায় নি, বরং 'সমকাম' এবং 'সমকামী' শব্দগুলোই কালের পরিক্রমায় বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে। কেউ কেউ সমকামিতাকে আরেকটু 'শালীন' রূপ দিতে 'সমপ্রেম' শব্দটির প্রচলন ঘটাতে চান , অনেকটা ইংরেজীতে আজকের দিনে ব্যবহৃত 'গে' বা 'লেসবিয়ন' শব্দের মত।

এখন কথা হচ্ছে সমকামিতা কি জন্মগত নাকি আচরণগত? এটি বুজতে হলে আমাদের যৌনপ্রবৃত্তিকে বুঝতে হবে। আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা কোন যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষন বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায় । ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে অনেক সময় সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল যৌনতার ক্ষেত্র কিন্তু খুবই বিস্তৃত। এতে সমকামিতা যেমন আছে তেমনি আছে উভকামিতা, কিংবা দুটোই, এমনকি কখনো রূপান্তরকামিতাও। আমি আমার প্রবন্ধ মূলতঃ 'সমকামিতা' বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব, যদিও অন্যান্য যৌন-প্রবৃত্তিগুলো (যেমন রূপান্তরকামিতা)ও বিভিন্ন সময় আলোচনায় উঠে আসবে। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, সমকামিতা নিঃসন্দেহে যেমন আচরণগত হত পারে, তেমনি হতে পারে জন্মগত বা প্রবৃত্তিগত। যাদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি জন্মগত, তাদের যৌন-প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না, তা সে থেরাপি দিয়েই হোক, আর ঔষধ দিয়েই হোক। মানুষের মস্তিস্কে হাইপোথ্যালমাস নামে একটি অংগ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সিমন লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালমাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমাকামিদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়।

আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এছারাও আরো বিভিন্ন গবেষণায় মনস্তাত্বিক নানা অবস্থার সাথে পিটুইটরি, থাইরয়েড, প্যারা-থাইরয়েড, থাইমাস, এড্রিনাল সহ বিভিন্ন গ্রন্থির সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়। যদিও 'গে জিন' বলে কিছু এখনো আবিস্কৃত হয়নি, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলের অভিমুখ কিন্তু সেই দিকেই (আমি এদের গবেষণা নিয়ে পরে আরো আলোচনা করব)। এই ধরণের গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হয় সমকামী মনোবৃত্তি হয়ত অনেকের মাঝেই জন্মগত বা জেনেটিক, আরো পরিস্কার করে বললে, 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড'। জন্মগত সমকামিরা 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড' হলেও আচরণগত সমকামীরা তা নয়। এরা আসলে বিষমকামী। এরা কোন ব্যক্তিকে বিষমলিঙ্গের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সাথে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। যেমন, জেলখানায় দীর্ঘদিন আটকে থাকা বন্দীরা যৌনসঙ্গীর অভাবে সমলিঙ্গের কয়েদীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেত পারে। কিন্তু, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যায়, এদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজের ছেলেপিলেদের সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। এই ধরণের যৌন প্রবৃত্তির বাইরেও আছে উভকামিতা, কিংবা আছে উভকামিতার সমকামিতা। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সে এই ধরনের বিভিন্ন যৌনতাকে পরিমাপ করার জন্য ১৯৪৮ সালে 'যৌনতা বিষয়ক স্কেল' উদ্ভাবন করেন। এই স্কেলের এক প্রান্তে আছে পরিপূর্ণ বিষমকাম, অন্যপ্রান্তে পরিপূর্ণ সমকাম। দুই মেরুর মাঝামাঝি রিয়েছে বিভিন্ন পর্যায়- প্রধাণতঃ বিষমকাম, তবে প্রায়ই সমকাম; সমান সমান বিষমকাম এবং সমকাম; প্রধানত সমকাম তবে প্রায়ই বিষম কাম; প্রধাণত সমকাম, তবে মাঝে মধ্যে বিষমকাম ইত্যাদি। কিন্সের এ স্কেল নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও এটি অন্ততঃ বোঝা যায় যে, আমাদের যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে খুবই বিস্তৃত, এবং যৌন প্রবৃত্তি একইভাবে সকলের মাঝে ক্রিয়াশীল হয় না।

যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই সেক্স বা যৌনতার উদ্ভব নিয়ে কিছু না কিছু বলতে হয়। রিচার্ড ডকিন্সের ' বিবর্তনীয় স্বার্থপর জিন' (selfish gene) তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে যৌনতার উদ্ভব নিঃসন্দেহে প্রকৃতির একটি মন্দ অভিলাস (bad idea)। কারণ দেখা গেছে অযৌন জনন (asexual) প্রক্রিয়ায় জিন সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি বংশ বিস্তার করা হয় (প্রকৃতিতে এখনো অনেক এককোষী জীব, কিছু পতংগ, কিছু সরিসৃপ এবং কিছু উদ্ভিদ- যেমন ব্ল্যাক বেরি অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে) তবে বাহকের পুরো জিনটুকু অবিকৃত অবস্থায় ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করা যায়। কিন্তু সে বাহক যদি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তার জিনের অর্ধেকটুকুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে এটি বাহকের জিনকে ভবিষ্যত প্রজন্মে স্থানান্তরিত করবার সম্ভাবনাকে সরাসরি অর্ধেকে নামিয়ে আনে। এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার আসলে কোন অর্থই হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মুল নির্যাসটিই হল - প্রকৃতি টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকেই বাড়তি সুবিধা দেয় যারা অত্যন্ত ফলপ্রসু ভাবে নিজ জিনের বেশি সংখ্যক অনুলিপি ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারে। সে হিসাবে কিন্তু অযৌন জননধারীরা (আমরা

এখন থেকে এদের 'অযৌনপ্রজ' নামে ডাকব) বহু ধাপ এগিয়ে আছে যৌনধারীদের (এদের ডাকব 'যৌনপ্রজ' নামে) থেকে।

কারণ অযৌনপ্রজদের যৌনপ্রজদের মত সময় নষ্ট করে সঙ্গী খুজে জোড় বাঁধতে হয় না। সংগম করে করে শক্তি বিনষ্ট করতে হয় না। নিজের বা সঙ্গির বন্ধ্যাত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। বুড়ো বয়সে ভায়াগ্রা সেবন করতে হয় না। কিংবা সন্তানের আশায় হুজুর সাঈদাবাদীর কাছে ধর্ণা দিতে হয় না। যথাসময়ে এমনিতেই তাদের বাচ্চা পয়দা হয়ে যায়। কিভাবে? আমরা এখন যে ক্লোনিং -এর কথা জেনেছি, এদের প্রক্রিয়াটা অনেকটা সেরকম। এক ধরনের 'প্রাকৃতিক ক্লোনিং' এর মাধ্যমে এদের দেহের অভ্যন্তরে নিষেক ঘটে চলে অবিরত। ফলে কোন রকম শুক্রানুর সংযোগ ছাড়াই দেহের ডিপ্লয়েড ডিম্বানুর নিষেক ঘটে চলে। জীববিজ্ঞানে এর একটি গালভরা নাম আছে - পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)।

কাজেই পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজরা সত্যিকার অর্থেই অপারাজেয়, অন্ততঃ যৌনপ্রজদের তুলনায়। এদের কোন পুরুষ সঙ্গীর দরকার নেই। সবাই এক এক জন মাতা মরিয়ম - সয়ম্ভু যীশু উৎপাদনে পারঙ্গম। যৌনপ্রজরা যে সময়টা ব্যয় করে সংগি খুঁজে তোষামোদ, আদর সোহাগের পশরা খুলে ধুঁকতে ধুঁকতে জিন সঞ্চালন করে, সে সময়ের মধ্যে অযৌনপ্রজরা গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করে ফেলতে পারে - এবং বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই। ফলে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' এরা বাড়তে থাকে গুনোত্তর হারে। নীচে এরকম একটি অযৌনপ্রজ প্রজাতি "হুইপটেল গিরগিটি"র ছবি দেওয়া হল।

চিত্রঃ হুইপ্টেল গিরগিটি - অযৌনপ্রজ প্রজাতির হার্টথ্রব। এদের বংশবিস্তারের জন্য কোন পুরুষ সঙ্গির প্রয়োজন নেই।

মজার ব্যাপার হল এই হুইপটেল গিরগিটিকূলের সবাই মহিলা, আর তা হবে নাই বা কেন! তাদের ত কোন পুরুষ শয্যাসংগীর দরকার নেই। পুরুষেরা তাদের জন্য 'বাহুল্যমাত্র'। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে সেক্স-

সদৃশ একধরনের ব্যাপার ঘটে। দেখা গেছে এক গিরগিটি আরেক গিরগিটিকে যদি জড়িয়ে ধরে রাখে তাহলে তাদের ডিম পাড়ার হার বেড়ে যায় । প্রকৃতির সমকামী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! তাই জীববিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন আমেরিকার দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে দেখতে পাওয়া এই গিরগিটিগুলোকে 'লেজবিয়ন লিজার্ড' হিসেবে তার 'ইভল্যুশনস রেইনবো' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাছে যত অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধই মনে হোক না কেন, হুইপটেল গিরগিটি বা এ ধরনের সরিসৃপদের কাছে কিন্তু এটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা, এবং এরা এভাবেই প্রকৃতিতে টিকে আছে, এবং টিকে আছে খুব ভালভাবেই। ২০০৬ সালে সরিসৃপকুলের আরেক প্রজাতি কমোডো ড্রাগন (Komodo Dragon) কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা পয়দা করে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দেয় ।

বিজ্ঞানীরা ২০০১ সালে নেব্রাস্কার ডুরলি চিরিয়াখানার হাতুরীমুখো হাঙ্গরেরও (Hammerhead shark) প্রজনন লক্ষ্য করেছেন কোন পুরুষসঙ্গির সাহায্য ছারাই। এগুলো সবই পার্থেনোজেনেসিস-এর খুবই স্বাভাবিক উদাহরণ। পার্থেনোজেনেসিসের আরো ভাল উদাহরণ খুঁজতে চাইলে বাংলাদেশের খোদ ঢাকা শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চলে যেতে পারেন। শুনেছি, আঁশ পোকা নামে এক বদখদ পোকায় নাকি ছেয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার গাছপালা। ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দারা রীতিমত আস্থির। প্রথম আলোতে এ নিয়ে রিপোর্ট পর্যন্ত হয়েছিল। বংশবৃদ্ধির জন্য এ পোকার কোন পুরুষ লাগে না, মাদী পোকাটি একাই হাজারে হাজার ডিম পেড়ে পঙ্গপালের মত বংশবৃদ্ধি করে আর আশেপাশের গাছপালাগুলোকে ছিবড়া বানিয়ে ফেলে।

আরো কিছু মজার উদাহরণ দেওয়া যাক। উত্তর আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরা আটলান্টিক স্লিপার শেল (Atlantic Slipper Shell) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরা হল ক্রিপিডুলা ফরমিক্যাটা (crepidula formicata)। এই প্রজাতির পুরুষেরা একা একা ঘুরে বেড়ায়। তারপর তারা কোন স্ত্রী সদস্যদের সংস্পর্শে আসে এবং সংগমে লিপ্ত হয়। যৌন সংসর্গের ঠিক পর পরই পুরুষদের পুরুষাংগ খসে পড়ে এবং এরা রাতারাতিও স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের পর এরা আর একাকী ঘুরে বেড়ায় না, বরং স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। প্রকৃতিতে পুরুষ থেকে নারীতে পরিনত হবার এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ক্রিপিডুলা নিয়ে গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে আরো নানা ধরনের বিচিত্র তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই এই প্রজাতির একটি সদস্যকে খুব ছোট অবস্থায় অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এর মধ্যে স্ত্রী জননাঙ্গের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি একে কোন পরিণত ক্রিপিডুলার সাথে রাখা হয়, তবে সে ধীরে ধীরে পুরুষে রূপান্তরিত হরে থাকে।

উত্তর আমেরিকার ওই একই অঞ্চলের 'ক্লিনার ফিশ' নামে পরিচিত এক ধরনের মাছের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে রূপান্তরকামীতার পরিস্কার প্রমাণ পেয়েছেন। এ মাছগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাবারিডেস ডিমিডিয়াটাস (Laborides dimidiatus)। এ প্রজাতির পুরুষেরা সাধারণতঃ পাঁচ থেকে দশজন স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধে (নাকি 'হারেম বাঁধে' বলা উচিৎ?)। কোন কারণে পুরুষ মাছটি মারা পড়লে স্ত্রীদের মধ্যে যে কোন একজন (সম্ভবতঃ সবচেয়ে বলশালী জন) সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই ওই স্ত্রীমাছটির মধ্যে দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দু সপ্তাহের মধ্যে সে

পরিপূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায় (তার গর্ভাশয় ডিম্বানু উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, এবং নতুন করে পুরুষাংগ গজাতে শুরু করে) এবং এবং অন্যান্য স্ত্রী মাছদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী থেকে পুরুষে রূপান্তরের এও একটি মজার দৃষ্টান্ত। রূপান্তরকামীতার উদাহরণ আছে এনিমোন (anemone) বা 'ক্লাউন মাছ'দের (Clown Fish) মধ্যেও। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামুদ্রিক প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি বেড়ে ওঠা মাছদের মধ্যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যৌনতার পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষের মধ্যেও রূপান্তরকামীতার অস্তিত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জরগেন্সেনের লেখা "Christine Jorgensen: A Personal Autobiography" বইটির কথা বলা যায়। ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের আগের নাম ছিল জর্জ জরগেন্সেন। তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। তার রূপান্তরকামী মানসিকতার জন্য চাকরী চলে যায়। পরে ১৯৫২ সালে অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। এ ধরনের অজস্র ঘটনার উদাহরণ হাজির করা যায়। উদাহরন দেওয়া যায় প্রখ্যাট জীববিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেনের। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের এ অধ্যাপক ৫২ বছর বয়সে পুরুষ থেকে নারীতে (জনাথন রাফগার্ডেন থেকে জোয়ান রাফগার্ডেনে) রূপান্তরিত হন। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, জোয়ান অব আর্ক থেকে শুরু করে আজকের বাস্কেটবল লিজেন্ড ডেনিস রডম্যান সহ অনেকের মধ্যেই যুগে যুগে রূপান্তর প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। এগুলোর পেছনে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক কারণকে অস্বীকার না করেও বলা যায় - এ ধরনের চাহিদা বা অভিপ্রায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। আর সে জন্যই, প্রখ্যাত রূপান্তরকামী বিশেষজ্ঞ হেনরী বেঞ্জামিন বলেন, আপাত পুরুষের মধ্যে নারীর সুপ্ত সত্তা বিরাজমান থাকতে পারে। আবার আপাত নারীর মধ্যে পুরুষের অনেক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তিনি বলেন - "Every Adam contains the element of Eve and every Eve harbors traces of Adam, physically as well as psychologically."

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে এখানে বিষমকামতা যেমন আছে, তেমনি আছে সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা কিংবা রূপান্তরকামিতা। এ যৌনপ্রবৃত্তিগুলোকে ঢালাওভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' অভিধায় অভিহিত করার আগে আমাদের আরেকটিবার চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকানো উচিৎ। এরপর সামগ্রিকভাবে বোঝা উচিৎ যৌনতার উদ্ভবকে। প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হল - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণিদের বেশিরভাগই উভলিংগ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite), কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোন শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। এরা এদের উভলিঙ্গত্ব নিয়েই স্বাভাবিক বংশবিস্তারে সক্ষম। অর্থাৎ, যে যৌনতার বিভাজনের জন্য আমরা যৌনপ্রজরা আজ গর্ববোধ করি, অবলীলায় অন্যদের 'অ্যাবনরমাল', 'আননেচারাল'-এর তকমা এঁটে দেই- গোড়ার দিকে কিন্তু প্রকৃতিতে যৌনতার সেরকম কোন সুস্পষ্ট বিভেদ ছিল না। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মানব সমাজেও উভলিঙ্গত্ব বিরল নয়। প্রাচীন গ্রীসে সমকামিতা, প্রাচীন রোমে খোজা প্রহরী (eunuch), নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'দ্বৈত সত্তা' (two-spirits), আরব ও পার্সিয়ায় 'বার্দাজ' এবং ভারতবর্ষে 'হিজরা'দের

অস্তিত্ব সেই সাক্ষ্যই দেয়। পশ্চিমা বিশ্বে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মত ইন্টারসেক্স -সেলিব্রিটিরা বহাল তবিয়তে বাস করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়েরা এদের অনেককেই 'অস্বাভাবিক' হিসবে চিহ্নিত করবেন। আমরা বরং এখন 'স্বাভাবিক' মানুষদের কথা বলি ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমরা গর্বিত 'স্বাভাবিক' মানুষেরাও নিজেদের দেহেই উভলিঙ্গত্বের বহু আলামত বহন করে চলেছি - নিজেদের অজান্তেই। যেমন, নারী জননাংগ পুরুষের মত না হলেও, পুরুষের শিশ্নের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যাকে ভগাংগুর বা ক্লাইটোরিস বলে। আবার অন্যদিকে পুরুষ শরীরে স্ফীত স্তন না থাকলেও স্তন ও স্তনবৃন্তের সুপ্ত উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষ্যনীয়। বলাবাহুল্য, বংশবিস্তারে এসমস্ত অংগের কোন ভূমিকা নেই, তবুও আমরা এসমস্ত 'এবনরমালিটি' বহন বহন করে চলেছি 'প্রাকৃতিক ভাবেই' - বিবর্তনের পথ ধরে। আরো কিছু উদাহরণ দেই। পুরুষ শরীরের থেকে ব্যাপক পরিমানে অ্যান্ড্রোজেন (androgen) যেমন নিঃসৃত হয়, তেমনি অল্প পরিমানে হলেও এস্ট্রোজেন (estrogen) নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই এস্ট্রোজেন 'স্ত্রী হরমোন' হিসেবে পরিচিত। ঠিক তেমনি, মেয়েরা স্ত্রী হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি সামান্য পরিমানে হলেও পুরুষ হরমোনও নিঃসরণ করে থাকে। এইভাবে বিপরীত লিঙ্গের অনেককিছুই আমরা প্রাণের উৎপত্তির ঊষালগ্ন হতে ধারণ করে চলেছি - এবং তা প্রাকৃতিকভাবেই। শুধু মানুষ কেন অনেক প্রানীর মধ্যেই এমনটি লক্ষ্যনীয়। আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী স্পটেড হায়নাদের কথা বলা যায়, যাদের নারী সম্প্রদায়কে দেখলে পুরুষ বলেই বিভ্রম হবার কথা। সায়েন্টেফিক আমেরিকানের জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যায় লেখা হয়েছে - "The large erectile clitoris of a female spotted Hyena closely resembles a male's penis. Much like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and dominance interactions". এ ধরনের 'পুরুষাংগ সদৃশ' দীর্ঘ ভগাংগুর শুধু স্পটেড হায়নাদের মধ্যে নয়, আছে কাঠবিড়ালী সদৃশ নিশাচর প্রাইমেট 'বুশ বেবী' এবং 'স্পাইডার মাঙ্কি' এবং 'উলি মাঙ্কি'র মধ্যেও। আবার বিপরীতটাও (মেয়েদের মত যৌনাংগ) দুর্লভ নয়। পুরুষ ডলফিন এবং তিমিদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত কোন 'বহিস্থ পুরুষাংগ' দেখা যায় না। এই জলজ স্তন্যপায়ীদের (Cetaceans) কোন অণ্ডাশয়ও নেই।

আবারো যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের গল্পে ফিরে যাই। বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে যৌনপ্রজদের যাবতীয় কাজ-কর্ম যে বিধ্বংসী রকমের অপচয়ী তা আগেই উল্লেখ করেছি। মানুষের কথাই ধরা যাক। একটি সুস্থ 'যৌনপ্রজ' দম্পতি তাদের দীর্ঘ জীবনে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে পঞ্চাশ বছর ধরে সঙ্গম করে থাকে। কিন্তু সে হিসেবে তাদের বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা থাকে নিতান্তই নগন্য - দুইটি কি তিনটি। উন্নত বিশ্বে এখন এমন দম্পতিও আছে যারা বাচ্চা কাচ্চা একেবারেই নেয় না। সে সব দেশে জন্মহার এখন পড়তির দিকে। কাজেই যৌনতার 'একমাত্র' উদ্দেশ্য যদি কেবল পরবর্তী প্রজন্মে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে বলতেই হয় এই আনাড়ি পদ্ধতিটি নিসন্দেহে একটি 'অকর্মার ধাড়ি'। শুধু মানুষ নয়, হাতী, গরিলা, শুয়োর, ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারা যৌন সংসর্গে যে পরিমানে সময় ও শক্তি

ব্যয় করে সে তুলনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করতে পারে একদমই কম। সারা জীবনের নব্বইভাগ যৌনসংসর্গেই কোন ধরনের অযাচিত প্রেগনেন্সির ভয় থাকে না। আর সমকামিতার উদাহরণ হাজির করলে তো সেক্সের মূল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। সেক্সের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি কেবল ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে সমকামীরা নিঃসন্দেহে "বায়োলজিকাল ডেড এন্ড"-এ। আর অনেক বিবর্তনবাদীরাই সেজন্য খুব যান্ত্রিকভাবে ডারউইনবাদকে সমকামিতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এমন সমস্ত 'যুক্তি' উপস্থাপন করা শুরু করেন যখন মনে হয় তাদের জায়গা ওই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সাথে একই বিছানায়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই 'যান্ত্রিক' ডারউইনবাদীরা সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌন-নির্বাচনের ধুঁয়া তুলে সমকামিতাকে অস্বীকার করেন, কিংবা বলার চেষ্টা করেন এরা প্রকৃতির এক ধরনের বিচ্যুতি (aberration)। ভাবখানা যেন, ওই দু'চারটা সমকামিদের নিয়ে অতটা চিন্তা আমাদের না করলেও চলবে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? তারা সমকামিদের সংখ্যা 'দু-চারটি' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী । অর্থাৎ, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশভাগই ওই যান্ত্রিক ডারউইনবাদীদের আভিলাসে ছাই দিয়ে অর্থাৎ জীন সঞ্চালনের 'মহৎ' প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে টিকে আছে। কিন্সের গবেষণা ছিল সেই চল্লিশের দশকে। সাম্প্রতিক কালে (১৯৯০) ম্যাকহুটার এবং স্টেফানি স্যান্ডার্স এবং জুন ম্যাকহোভারের গবেষনা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে শতকরা প্রায় চোদ্দ ভাগের মত সমকামি রয়েছে । ১৯৯৩ সালে 'জেনাস রিপোর্ট অন সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার' থেকে জানা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রায় শতকরা নয় ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ সমকামি রয়েছে । কাজেই সংখ্যা হিসেবে সমকামিদের সংখ্যাটা কিন্তু এ পৃথিবীতে কম নয়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইণ্ড-এর ২০০৬ এর একটি ইস্যুতে সমকামীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ৩ থেকে ৭ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, পরিসংখ্যানগুলোর পরিসীমা একে অন্যের খুব কাছাকাছি (মোটামুটি ৫-১৫ ভাগ) হলেও কোনটাই হয়ত প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করছে না। কারণ সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই থেকে যায় সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার। অনগ্রসর সমাজে এই চাপ আরো প্রবল। ফলে অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজের চাপে একজন প্রকৃত সমকামি বিষমকামী হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামী কিংবা বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছেন। এদের বলা হয় নিভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মীর কথা জানি যিনি নিভৃত সমকামী হয়ে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহিত জীবনযাপন করছেন।

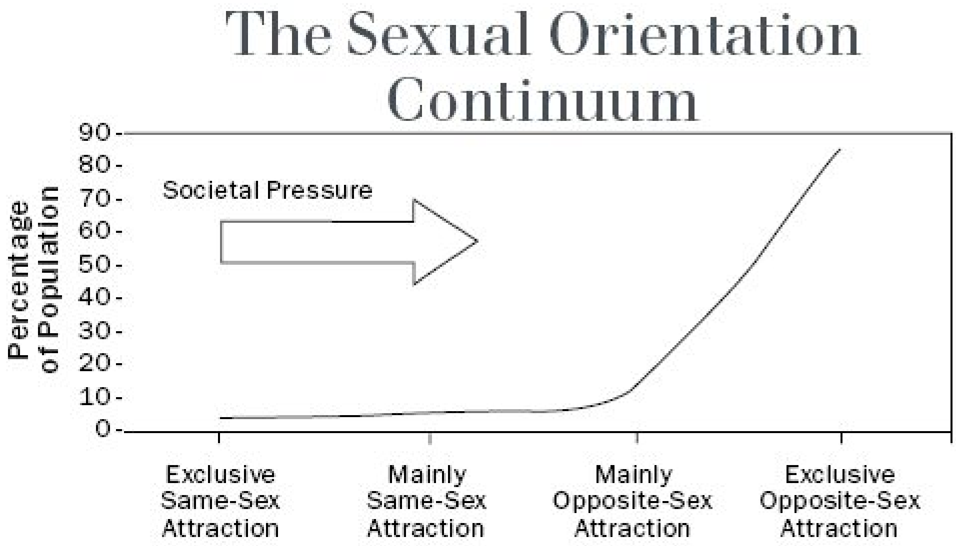

চিত্র : আমাদের সমাজে সবসময়ই একটা চাপ থাকে সমকামীদের নিরুৎসাহিত করে বিষমকামের দিকে ঠেলে দেওয়ার।

আরেকজন ‘বিবাহিত সমকামীর’ কথা পড়েছিলাম একটি কেস স্টাডিতে। উনি দিল্লিতে বসবাসরত দন্ত চিকিৎসক। নাম রমেশ মন্ডল। নিজে সমকামী। কিন্তু পারিবারিক চাপে পড়ে তাঁকে একসময় বিয়ে করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক স্রেফ যান্ত্রিক। তিনি তার যৌনচাহিদা নিরসন করেন গোপনে তার এ সমকামী বন্ধুর সাথে। কখনো-সখনো জব্বলপুর, কোলাপুরে চলে যান। তার স্ত্রী আজো এ ব্যাপারটি জানেন না। সম্পূর্ন মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে রমেশের দাম্পত্য জীবন। আরেক সমকামি ভদ্রলোক নীতিন দেশাই স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যান মুম্বই-এর চৌপাট্টির সমুদ্র সৈকতে। কারণ সহজেই অনুমেয়।

অনেক পাঠক হয়ত পাকিস্তানী সমকামী কবি ইফতি নাসিমের ব্যক্তিগত জীবনের সমপ্রেমের মর্মন্তুদ কাহিনী জানেন। কবি নাসিম ছোটবেলা থেকেই তার সমবয়সী একটি ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই কিশোর কৈশোরকাল অতিক্রম করে বড় হলো। পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে তারা তখন প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাসা থেকে এল বিয়ের চাপ। এমন কি ইফতির বন্ধুটির বাসার লোকজন মেয়ে টেয়ে দেখে তার বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল। ইফতির বন্ধু সেদিন তার সমকামী মানসিকতার কথা বাসায় খুলে বলতে পারেন নি। আর তাছারা পাকিস্তানী গোড়া মুসলিম সমাজে বড় হবার কারনে সমাকামিদের প্রতি ঘৃণাউদ্রেককারী কোরাণের আয়াতগুলোর কথাও তার ভালই জানা ছিলো। ফলে যা হবার তাই হল। বেশ ধূম ধাম করে বিয়ে হল ওই বন্ধুর। সে বিয়েতে ইফতিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং হাজিরও ছিলেন। ফুলশয্যার রাতে বন্ধুর বাড়িতে ইফতি ছিলেন। যে মানুষটির সাথে তার এতদিনের প্রেমের সম্পর্ক, সে মানুষটি সমাজের চাপে পড়ে এক অচেনা নারীর বাহুলগ্ন হবেন, এ চিন্তা তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল - ‘আজকে রাতে তুমি অন্যের হবে, ভাবতেই চোখ জলে ভিজে যায়’! সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। এ পাশ ও পাশ করে কাটালেন। শেষ রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলেন ইফতি। দরজা খুলে ইফতি দেখলেন- অসহায়ভাবে বাইরে তার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। দু’জনেই নির্বাক।

শুধু বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে কেন, খোদ আমেরিকাতেও একই অবস্থা। জেমস ম্যাকগ্রিভি তাঁর নিভৃত সমকামের কথা স্বীকার করে নিউজার্সির গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০০৪ সাল । সমাজে ইফিতি নাসিম বা ম্যাকগ্রিভির মত লোকদের 'কামিং আউট অব ক্লোসেট' হিসবে বিবেচনা করা হয়।

মানুষের কথা বাদ দেই, প্রানীজগতেও কিন্তু সমকামিদের সংখ্যা নেহাৎ মন্দ নয়। গবেষকরা অনেকদিন ধরেই এ নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রসঙ্গতঃ লু হুজি, কর্ণেল লক, জিউনার, জুরের, হাবাক, উইলিয়ামস, শের জং, জেন গুডোয়ল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ গবেষনার কথা উল্লেখ করা যায়। এদের গবেষণার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে থাকে প্রানীজগতের নানা অজানা তথ্য। আবার অন্যদিকে অ্যালেন, প্রেনটিস, অ্যালেন লিস, জেমসন, মারফি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রানীজগতের যৌনতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা চালিয়েছেন। তাদের গবেষনায় প্রানীজগতে সমকামিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ধরা পরে। সে নিদর্শনগুলোর নমুনা জানতে চাইলে পাঠকেরা জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিলের লেখা '*বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স : এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি*' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বইটিতে ব্রুস ব্যাগমিল প্রকৃতিতে ৪৫০টির ও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন। প্রাইমেট বর্গের মধ্যে সাধারণ শিম্পাঞ্জিদের প্রজননহীন যৌনতা খুবই প্রকট। মানুষের মতই তারা কেবল 'জিন সঞ্চালনের' জন্য সঙ্গম করে না, সম্ভবতঃ করে আনন্দের জন্যও। কাজেই তাদের মধ্যে মুখ-মৈথুন, পায়ু মৈথুন থেকে শুরু করে চুম্বন, দংশন সব কিছুই প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। তারা খুব সচেতনভাবেই সমকাম, উভকাম এবং বিষমকামে লিপ্ত হয়। শিম্পাঞ্জীদের আরেকটি প্রজাতি বনোবো শিম্পাঞ্জী (প্রচলিত নাম পিগমী শিম্পাঞ্জী)দের মধ্যে সমকামি প্রবণতা এতই বেশি যে, ব্যাগমিল বলেন, এই প্রজাতিটির ক্ষেত্রে 'Homosexual activity is nearly as heterosexual activity …. '। একেকটি গোত্রে এমনকি শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য উভকামিতার সাথে যুক্ত থাকে। এরকম সমকামি এবং উভকামি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে গরিলা, ওরাং-ওটান, গিবন, সিয়ামাং, লঙ্গুর হনুমান, নীলগিরি লঙ্গুর, স্বর্ণ হনুমান, প্রবোসিক্স মাঙ্কি ইত্যাদি প্রাইমেটদের মধ্যেও। প্রাইমেট ছাড়াও সমকামি আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেও। এদের মধ্যে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, পাহাড়ি ভেড়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেব্রা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধুসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন সহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। সমকামিতার অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডারের মত উভচর এবং বিভিন্ন মাছেও।

এখন তাইলে কথা হচ্ছে, যদি প্রচলিত মত অনুযায়ী সমকামিরা 'বায়োলজিকাল ডেড এন্ড' কিংবা প্রকৃতিজগতের বিচ্যুতিই হয়ে থাকে, তবে এই হারে সমকামীরা এ পৃথিবীতে টিকে থাকল কি করে? আমাদের বুঝতে হবে যে, যত স্বল্প সংখ্যকই হোক না কেন, প্রানীজগতে সমকামিতার প্রবৃত্তি একটি বাস্তবতা, শুধু

মানুষের ক্ষেত্রে নয়, প্রাণিজগতের প্রায় সকল প্রজাতির ক্ষেত্রেই। প্রকৃতিতে সবসময়ই খুব ছোট হলেও একটা অংশ ছিল এবং থাকবে যারা যৌনপ্রবৃত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কেন এই ভিন্নতা? এর একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় ইকোলজিস্ট জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসব্রুগ তার "Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People." বইয়ে। তিনি বলেন, যৌনতার উদ্দেশ্য সনাতনভাবে যে কেবল 'জিন সঞ্চালন করে বংশ টিকিয়ে রাখা' বলে ভাবা হয়, তা ঠিক নয়। যৌনতার উদ্দেশ্য হতে পারে যোগাযোগ এবং সামাজিকিকরণ। তিনি বলেন :

> 'যদি আপনি সেক্স বা যৌনতাকে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখেন, তাহলে আপানার কাছে অনেক কিছুই পরিস্কার হয়ে যাবে, যেমন সমকামিতার মত ব্যাপার স্যাপারগুলো - যা জীব বিজ্ঞানীদের বছরের পর বছর ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামী সংশ্রব বিষমকামীদের মতই দেদারসে ঘটতে দেখা যায়। আর বনোবোরা কিন্তু প্রকটভাবেই যৌনাভিলাসী। তাদের কাছে যৌনসংযোগের (Genital contact) ব্যাপারটা আমাদের 'হ্যালো' বলার মতই সাধারণ। এভাবেই তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। এটি শুধু দলগতভাবে তাদের নিরাপত্তাই দেয় না, সেই সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আহরণ এবং সন্তানদের লালন পালনও সহজ করে তুলে'।

শুধু বনোবো শিম্পাঞ্জীদের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশেই আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেখানে ছেলেদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হলে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে, হাতে হাত ধরে কিংবা ঘারে হাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করে। ঝগড়া-ঝাটি হলে বুকে জড়িয়ে ধরে আস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে। মেয়েরাও তাই। এই আচরণ একটু প্যাসিভ তবে এ ধরনের প্রেরণা কিন্তু মনের ভেতর থেকেই আসে। বলা বাহুল্য, এই প্রেরণার মধ্যে কোন জিন সঞ্চালনজনিত কোন উদ্দেশ্য নেই, পুরোটাই যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরনের প্রকাশ।

যোগাযোগ আর সামাজিকরণের কথা মাথায় রেখেই জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসব্রুগ তার বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত 'ইভ্যলুশনস রেইনবো' (পূর্বে উল্লিখিত) বইয়ে 'যৌনতার নির্বাচন' (sexual selection)-এর বদলে 'সামাজিক নির্বাচন' (social selection) - এর প্রচলন ঘটানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, প্রানীজগতের সাংগঠনিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের খাবার, সঙ্গী প্রভৃতির সঠিক নির্বাচনের উপর। প্রাণিজগতের এই নির্বাচনই কখনো রূপ নেয় সহযোগিতায়, কখনো বা প্রতিযোগিতায়। এবং এটাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পারিবারিক বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক

একগামিতা বা মনোগামিতে রূপ নিতে পারে (মানুষ ছাড়াও কিছু রাজহাঁস, খেঁকশিয়াল, কিছু পাখির মধ্যে একগামী সম্পর্ক আছে), কখনো বা রূপ নেয় বহু(স্ত্রী)গামিতা বা পলিগামিতা (সিংহ, বহু প্রজাতির বানরের মধ্যে এরকম হারেম তৈরি করে ঘোরার প্রবণতা আছে), কখনোবা বহু(পুরুষ)গামিতা বা পলিঅ্যান্ড্রি (কিছু সিংহ, হরিণ এবং প্রাইমেটদের মধ্যে)তে। এমনকি অনেকসময় দলে একাধিক 'জেন্ডারের' মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, ব্লু গ্রীন সানফিশ নামের একপ্রজাতির মাছ আছে যেখানে এক একটি ঝাঁকে দুই পুরুষ মাছের মধ্যে সমধর্মীযৌনতার বন্ধন (same-sex courtship) গড়ে উঠে। এখানে মুখ্য পুরুষ মাছটি (এদের 'আলফা মেল' বলা হয়) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে আর তারপর অপর পুরুষ মাছটিকে সাথে নিয়ে তাদের যৌথ সাম্রাজ্যে স্ত্রীমাছগুলোকে ডিম পাড়তে আমন্ত্রণ জানায়। অনেকসময় দ্বিতীয় পুরুষ মাছটি স্ত্রী মাছের অনুকরণ করে স্ত্রী মাছের ঝাকের সাথে মিশে যায় - যা অনেকটা আমাদের সমাজে বিদ্যমান ক্রস-জেন্ডার প্রতিনিধিদের মতই। ড. রোথসব্রগের মতে, যৌন-প্রকারণ এবং সমধর্মী যৌনতা এভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে, যা অনেক সময়ই মোটা দাগে কেবল শুক্রানুর স্থানান্তর নয়। সামাজিক নির্বাচন হচ্ছে সেই বিবর্তন যা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখে। ড. রোথসব্রগের মত সামাজিক নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করেন ব্রুস ব্যাগমিল এবং পল ভ্যাসি সহ অনেক বিজ্ঞানীই।

তবে বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানীই এখনই 'যৌনতার নির্বাচনকে' সরিয়ে দিয়ে 'সামাজিক নির্বাচন'কে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নন, কারণ প্রকৃতিজগতের বেশিরভাগ ঘটনাকেই 'যৌনতার নির্বাচন' দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী জীববিদ জেরি কয়েন রোথসব্রগের সমালোচনা করে বলেন : 'She ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen who bicycle to work.'। নেচার পত্রিকায় রোথসব্রগের বইটির ভুয়সী প্রসংশা করার পরও তার 'সামাজিক নির্বাচন' তত্ত্বের সমালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদ সারাহ হর্ডি বলেন - '(তার) এ (উদাহরণ) গুলো যৌনতার নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপযুক্ত কারণ নয়, বরং এগুলো হতে পারে জীব-বৈচিত্রকে (সামাজিকভাবে) গ্রহণযোগ্য করার অনুপ্রেরণা'। এর কারণ আছে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমেই হোমসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমকামিতার জিন (যদি থেকে থাকে) যোগাযোগ ও সামাজিকতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উপযোগী তা বনোবো শিম্পাঞ্জীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আবার এমনো হতে পারে মানুষের মধ্যে 'গে জিন'-এর ভূমিকা পুরুষ এবং স্ত্রীতে ভিন্ন হয়। ইতালীর একটি সমীক্ষায় (২০০৪) দেখা গেছে, যে পরিবারে সমকামী পুরুষ আছে সে সমস্ত পরিবারে মেয়েদের উর্বরতা (fertility) বিষমকামী পরিবারের চেয়ে বেশি থাকে। আন্দ্রিয়া ক্যাম্পেরিও-সিয়ানির ওই গবেষণা থেকে জানা যায়, বিষমকামী পরিবারে যেখানে গড় সন্তান সন্ততির সংখ্যা ২.৩ সেখানে গে সন্তানবিশিষ্ট পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ২.৭ । এছাড়া এডয়ার্ড ও উইলসন 'কিন সিলেকশন'-এর মাধ্যমে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই ১৯৭৮ সালেই। টক-অরিজিনের এই লিঙ্কটিতেও বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সমকামিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে কারনেই সমাজে হোমোসেক্সুয়ালিটির অস্তিত্ব থাকুক না কেন, এবং সেগুলোকে উপস্থাপনের সঠিক মডেল নিয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যত

বিতর্কই থাকুক না কেন (বিজ্ঞানে এধরনের বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক), এটি এখন মোটামুটি সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন (যান্ত্রিক ডারউইনবাদী আর গুটিকয় ধর্মান্ধ বিজ্ঞানীরা ছাড়া) যে, সমকামিতার মত যৌন-প্রবৃত্তিগুলো 'অস্বাভাবিক' বা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' নয়, বরং বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও তত্ত্বের সাহায্যেই এই ধরনের যৌন-প্রবৃত্তিগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়; জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। আজ আমি যখন এ লেখাটি লিখতে বসেছি তখন সারা পৃথিবী জুড়ে চারশ'রও বেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গে জিন নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

আধুনিক চিকিৎসকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিই মনে করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞাসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত। তারপরও বাংলাদেশ সহ অনেক রাষ্ট্রেই সমকামিতা স্বীকৃত নয়, অনেক জায়গাতেই এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে সমকামীদের হয় লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অভ্যস্ত হতে হয় 'ক্লোসেট গে' হয়ে 'বিবাহিত' জীবন যাপনে। পশ্চিমা বিশ্ব কিছুটা হলেও এ ব্যাপারে উদার হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। সেখানে গে এবং লেসবিয়ানরা বিশ্বের বহু দেশে সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত বৈধতার জন্য কয়েক যুগব্যাপী আন্দোলন করছেন, অংশ নিচ্ছেন 'গে-প্রাইড' মার্চে। তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার কয়েকটি স্টেটে সমকামী বিয়ে আজ স্বীকৃত। ব্রিটেনেও টনি ব্লেয়ারের সরকার কয়েক বছর আগে প্রথম সমকামী যুগলদের স্বীকৃতি দিয়েছে। পশ্চিমে সমকামী-অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান দেশ তাদের আইন সংস্কারে এগিয়ে এসেছে। চীনে আগে মাও সে তুংয়ের আমলে মনে করা হতো, সমকামিতা হচ্ছে 'পুঁজিবাদের বিকৃতি'। কিন্তু আশির দশক থেকে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন সংবিধান হয় তাতে শুধু ধর্মই নয়, যৌনতা বিষয়ে কোনো বৈষম্য করা হবে না এমন ধারা সংযোজিত হয়। আমরা আশা করব, যুগের দাবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একটা সময় সমকামিতার প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে উঠবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়দের যাতাকলে নিয়ত পিষ্ট সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষগুলোর আইনী অধিকার স্বীকৃত হবে। আর সেজন্য দরকার আমাদের সবার বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তথ্যসূত্রঃ

১। রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ, ১২৯৬, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।
২। Dylan Evans & Howard Selina, *Introducing Evolution*, Icon Books, UK, 2001
৩। Joann C. Gutin, *Why Bother? Sex seems like an unnecessary complicated means of reproducing. So how did it ever started? And why did it catch on?* Discover, June, 1992.

৪। David Crews, *Animal Sexuality*, Scientific American, January, 1994
৫। অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।
৬। Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , *Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male*, W. B. Saunders Company , 1953
৭। David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders and June Machover Reinisch, *Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation*, Oxford University Press, USA, 1990
৮। John Maynard Smith, *The Evolution of Sex*, Cambridge University Press; 1978।
৯। Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, Stonewall Inn Editions, 2000
১০। Simon Levay and Dean H. Hamer, *Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality*, Scientific American, May 1994.
১১। Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004।
১২। Sarah Blaffer Hrdy, Sexual diversity and the gender agenda, Nature 429, pp 19 – 21, 06 May 2004
১৩। Talk Origin, Claim CB403: Evolution does not explain homosexuality; http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB403.html
১৪। Leslie Feinberg, Transgender Warriors : Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman, Beacon Press, 1997.
১৫। অভিজি রায়, সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ? একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনঃস্তাত্বিক আলোচনা, মুক্তমনা।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com